وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ
لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا
سُبْحٰنَهٗ ۭ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ
بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ
لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾
وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۭ
كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۭ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۗءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۭ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ
تَمِيْدَ بِهِمْ ۠ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾
وَجَعَلْنَا السَّمَاۗءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾
وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ
فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۭ
اَفَاْىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ
الْمَوْتِ ۭ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۭ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾

(২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর। (২৬) তারা বলল ঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে। তাঁর জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। (২৮) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি জালেমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (৩০) কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (৩১) আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (৩৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। (৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ্র সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহ্র সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না। এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয় ; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا এখানে رؤيت (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا - رتق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া এবং فتق এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি رتق ও فتق কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে "বন্ধ হওয়া" ও "খুলে দেয়ার" অর্থ কি এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায় কেরাম ও সাধারণ তফসীরবিদগণের যে উক্তি গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া।

তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে যেয়ো। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌঁছে বলল যে, আয়াতে উল্লেখিত رتقا ও فتقنا বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ, তরুলতা ইত্যাদি অঙ্কুরিত হত না আল্লাহ্ তাআলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তফসীর জেনে নিয়ে হযরত ইবনে ওমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর এ তফসীর শুনে বললেন ঃ এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাসকে কোরআনের ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে কোরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি رتق ও فتق এর নির্ভুল তফসীর করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۗءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও

জীবন প্রমাণিত আছে। বলাবাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাসীর ইমাম আহ্‌মদের সনদ দ্বারা হযরত আবু হুরায়রার এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলাম; "ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।" জওয়াবে তিনি বললেন ঃ "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।"

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ আরবী ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তাআলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তফসীর কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তফসীর বয়ানুলকোরআনে সূরা নমলের তফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীও এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা করেছেন।

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فلك বলা হয়। এ কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فلكة المغزل বলা হয়। (রূহুল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও فلك বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নীচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছেন। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফের ও মুশরেকদের বিভিন্ন দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবীসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ওযায়র (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মক্কার মুশরেকরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দ্রুত মৃত্যু-কামনা করত ; যেমন – কোন কোন আয়াতে আছে نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (আমরা তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই অনর্থক কামনার দু'টি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তাঁর ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রসূল নয়, রসূল হলে মৃত্যু হত না ; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুওয়ত স্বীকার কর, তাঁর কি মৃত্যুবরণ করেননি? তাঁদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুওয়ত ও রেসালতে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুওয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে?

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীব-মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نفس বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি-না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত।— (রূহুল-মা'আনী) আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহপিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশতটি প্রমাণ উপস্থিত করেছে।— (রূহুল-মা'আনী)

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্যে ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়।

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা ঃ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً অর্থাৎ, আমি মন্দ ও ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়। যেমন— অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্যে সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুযুর্গগণ বলেন ঃ বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাক অধিক কঠিন। তাই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ

بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر— অর্থাৎ, আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ, এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۘ اَهٰذَا
الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾
خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۭ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٣٧﴾
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا
عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٤٠﴾
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا
مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۭ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾
اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ۭ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ
اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَاۗءِ وَ
اٰبَاۗءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۭ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۭ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ
اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۗءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

(৩৬) কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? এবং তারাই তো রহমান'-এর আলোচনায় অস্বীকার করে। (৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ, আমি সত্বরই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। অতএব আমাকে শীঘ্র করতে বলো না। (৩৮) এবং তারা বলে ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৩৯) যদি কাফেররা ঐ সময়টি জানত, যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪০) বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিতভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও অনেক রসূলের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে। (৪২) বলুন ঃ 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হেফাযত করবে রাত্রে ও দিনে। বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (৪৩) তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার মোকাবেলায় সাহায্যকারীও পাবে না। (৪৪) বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে? (৪৫) বলুন ঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ত্বরা-প্রবণতা নিন্দনীয় ঃ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ - عجل -শব্দের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا —অর্থাৎ, মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ। হযরত মূসা (আঃ) যখন বনী-ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তূর পর্বতে পৌঁছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে "ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে" প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা ত্বরা-প্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোন কাজ করা নয় ; রবং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পুণ্যকাজ করার চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরা-প্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণতঃ কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে ঃ লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ — এখানে اٰيات (নির্দেশনাবলী) বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মু'জেযা ও অবস্থা বোঝানো হয়েছে ;—(কুরতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হত।

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰوَيْلَنَآ
اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ
فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا
مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ
مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَ
كُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ
الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا
عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾
قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ
فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَ
تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

(৪৬) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম।' (৪৭) আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (৪৮) আমি মূসা ও হারুনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ, আল্লাহ্‌-ভীরুদের জন্যে — (৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কেয়ামতের ভয়ে শঙ্কিত। (৫০) এবং এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর? (৫১) আর, আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তার সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাতও ছিলাম। (৫২) যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন ঃ ''এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ'' ? (৫৩) তারা বলল ঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। (৫৫) তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করেছ, না তুমি কৌতুক করছ? (৫৬) তিনি বললেন ঃ না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন ; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। (৫৭) আল্লাহ্‌র কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা ঃ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ – موازين শব্দটি ميزان –এর বহুবচন। অর্থ— ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্যে অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। তদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। قسط শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। অর্থাৎ, এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে - সামান্যও বেশ-কম হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্যে এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে।—(মাযহারী)

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا — অর্থাৎ হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাব ও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ ঃ তিরমিযী হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সামনে বসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌, আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন ঃ তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালি-গালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশী হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ করনি وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ --লোকটি আরয করল ঃ এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।—(কুরতুবী)

الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ — এই তিনটি গুণই তওরাতের। فرقان অর্থাৎ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, ضياء অর্থাৎ, মানবাত্মার জন্যে আলো এবং ذكر অর্থাৎ মানুষের জন্যে উপদেশ ও হেদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন ঃ فرقان বলে আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মূসা (আঃ)-এর সাথে ছিল ; অর্থাৎ ফেরাউনের মত শত্রুর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবেলার সময় আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরাউনকে লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফেরাউনী

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾
قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا
سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا
فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالُوْٓا
ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ
كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى
اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى
رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ
لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾
قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾
قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَاَرَادُوْا
بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا
اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ
اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾

(৫৮) অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীত ; যাতে তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে।(৫৯) তারা বলল : আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। (৬০) কতক লোকে বলল : আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়। (৬১) তারা বলল : তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। (৬২) তারা বলল : হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ? (৬৩) তিনি বললেন : না, এদের এই প্রধানই তো একাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল : লোকসকল ; তোমরাই বে-ইনসাফ। (৬৫) অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে : ''তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না''। (৬৬) তিনি বললেন : তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? (৬৭) ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না? (৬৮) তারা বলল : একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি বললাম : 'হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' (৭০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। (৭১) আমি তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কারস্বরূপ দিলাম ইয়াকূব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করলাম।

সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল-সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। ذكر ও ضياء উভয়টিই তওরাতের বিশেষণ। কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, الْفُرْقَانَ এর পরে واو দ্বারা পৃথক করা থেকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে فرقان তওরাত নয় —অন্য কোন বিষয়।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ একথাই বোঝায় যে, একথাটি ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদের কাছে اِنِّيْ سَقِيْمٌ (আমি অসুস্থ)-এর ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হল যে, কাজটি কে করল? যদি ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বোঝে নিত যে, ইবরাহীমই একাজ করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরে সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় তাঁর কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবতঃ তাঁর কথার দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং ভুলেও যায়।—(বয়ানুল-কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। ইবরাহীম (আঃ)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ্‌ বলেন : ইবরাহীম (আঃ) উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি ; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে।—(কুরতবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا — جُذٰذًا শব্দটি جذ — এর বহুবচন। এর অর্থ খন্ড। অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খন্ডবিখন্ড করে দিলেন।

اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ —অর্থাৎ, শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার-আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ – اليه শব্দের সর্বনাম দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি একাজ কেন করলে? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খন্ড-বিখন্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (দুই) কলবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা كبير (প্রধান মূর্তি)-কে

বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খন্ড-বিখন্ড এবং বড় মূর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবতঃ এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হল? সে যখন কোন উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি মিথ্যা নয়-- রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ঃ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্যে প্রশ্ন করল ঃ তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি? তখন ইবরাহীম (আঃ) জওয়াব দিলেন ঃ না, এদের প্রধানই একাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যতঃ বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহ্‌র দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্যে তফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানুল-কোরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এ উক্তি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল; অর্থাৎ, তোমারা একথা ধরে নাও না কেন যে, একাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না; যেমন-- কোরআনে আছে إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ অর্থাৎ, রহমান 'আল্লাহ্' এর কোন সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তাঁর এবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন জওয়াব বাহ্‌রে-মুহীত, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে اسناد مجازى তথা রূপক ভঙ্গিতে ইবরাহীম (আঃ) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আঃ)-কে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবতঃ এ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণতঃ যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কার্যতঃও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কূড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই একাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি انبت الربيع البقلة (অর্থাৎ, বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যতঃ ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দ্বীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবতঃ পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে একাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তাআলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা খোদা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হত, তবে কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে ঃ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ মোটকথা, কোন দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরোক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ ঃ এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث -- অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেননি।--(বোখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহ্‌র জন্যে বলা হয়েছে। একটি بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ --আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওযর পেশ করে إِنِّي سَقِيمٌ (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হেফাযতের জন্যে বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী হযরত সারাহ্‌সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল যালেম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই যালেম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছে দিলে সে হযরত সারাহ্‌কে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম (আঃ) যালেমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বলে দিলেন ঃ সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহ্‌কে গ্রেফতার করা হল। ইবরাহীম (আঃ) সারাহ্‌কে বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিরপীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আঃ) যালেমের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সবিনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ্ যালেমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সারাহ্‌কে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ

সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহ্‌র দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনার পর সে সারাহ্‌কে ফেরত পাঠিয়ে দিল। (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ।) এই হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুওয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না ; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় ''তওরিয়া''। এর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আঃ) নিজেই সারাহ্‌কে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলাবাহুল্য এটাই ''তওরিয়া''। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের ''তাকায়্যুহ'' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহ্‌র মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না ; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে ; যেমন— ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লেখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না ; বরং তওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ —এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। اِنِّىْ سَقِيْمٌ বাক্যটিও তদ্রূপ। কেননা, سقيم (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ, চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম (আঃ) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই ''আমি অসুস্থ'' বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বোঝেছিল। এই হাদীসেই ''তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহ্‌র জন্যে ছিল'' এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন গোনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গোনাহের কাজ আল্লাহ্‌র জন্যে করার কোন অর্থই হতে পারে না ; গোনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয় ; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে — একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আঃ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া মূর্খতা ঃ মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্যের পন্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্‌র দোস্ত ইবরাহীম (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই খলীলুল্লাহ্‌কে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরপন্থী। এরপর তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের পরিপন্থী হবেন, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধসনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং স্বল্পবুদ্ধিতা ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে একথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, ''তিনটি মিথ্যা'' বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে كذبات (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হল? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মূসা (আঃ)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আঃ)- এর ভুলকে غوى ও عصى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে ; অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কোরআন পাক এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্যে পয়গম্বরগণের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোন ত্রুটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্যে দন্ডায়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ হাদীসে বর্ণিত তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যে নিজের দোষ ও ত্রুটি সাব্যস্ত করে ওযর পেশ করবেন। এই ত্রুটির দিকে ইশারা করার জন্যে হাদীসে এগুলোকে كذبات তথা, 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ) মিথ্যা বলেছে বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আঃ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহ্‌রে-মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তেলাওয়াত, কোরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লেখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা ঃ হাদীসে ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র জন্যে ছিল, কিন্তু হযরত সারাহ্‌ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাত দ্বীনের কাজ। এ সম্পর্কে তফসীরে-কুরতুবীতে কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী থেকে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন ঃ তৃতীয়-মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দ্বীনেরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হোফাযত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে فِى اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র মধ্যে) এবং لله (আল্লাহ্‌র জন্যে) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ঃ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ —(খাঁটি এবাদত আল্লাহ্‌র

জন্যেই) স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হত। কিন্তু পয়গম্বরগণের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাঁদের জন্যে এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুন্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ ঃ যারা মু'জেযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোন বস্তুর সত্তার জন্যে অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না— দর্শনশাস্ত্রের এইনীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোন বস্তুর সত্তার জন্যে কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহ্‌র চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্যে উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরী, পানির জন্যে ঠান্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরী, কিন্তু এই জরুরী অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ— যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ পেশ করতে পারেননি; এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ্ তাআলা যদি কোন বিশেষ রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ আর পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করে; অথচ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে ; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরগণের নবুওয়ত প্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা নমরূদের অগ্নিকুন্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন ঃ তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি بَرْدًا (শীতল) শব্দের আগে وَّسَلٰمًا (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। নূহ (আঃ)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا — অর্থাৎ, তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

حَرِّقُوْهُ — অর্থাৎ, সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাত দিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুন্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। শয়তান ইবরাহীম (আঃ)-কে 'মিন্‌জানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাত্‌লে দিল। যে সময় ইবরাহীম (আঃ) মিন্‌জানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চীৎকার করে উঠল ঃ ইয়া রব, আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ্ তাদের সবাইকে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্যে ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হল ঃ প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে।—(মাযহারী)

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ —পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষে সম্ভবতঃ অগ্নি অগ্নিই ছিল না ; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দহন করছিল। ইবরাহীম (আঃ)-কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আঃ) এই অগ্নিকুন্ডে সাত দিন ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি।—(মাযহারী)

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ — অর্থাৎ, ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (অর্থাৎ, ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্যে কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ, সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ۭ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً —অর্থাৎ, আমি তাঁকে (দোয়া ও অনুরোধ আনুযায়ী) পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকূবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نَافِلَة বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾
وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ
كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾
وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَنُوْحًا
اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوٗدَ
وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ
الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ
وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ؗ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ
لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ
شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖۤ
اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

(৭৩) আমি তাঁদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তাঁরা আমার এবাদতে ব্যাপৃত ছিল। (৭৪) এবং আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (৭৫) আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন। (৭৬) এবং স্মরণ করুন নূহকে ; যখন তিনি এর পূর্বে আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাঁকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম। (৭৮) এবং স্মরণ করুন দাঊদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাঊদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? (৮১) এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে জনপদ থেকে লূত (আঃ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদুম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল (আঃ) ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের বসবাসের জন্যে একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেয়া হয়েছিল।—(কুরতুবী)

تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ - خبائث শব্দটি خبيثة—এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে خبائث বলা হয়। "লাওয়াতাত" ছিল তাদের সর্বপ্রধান নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অভ্যাসকে خبائث বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখিত আছে। রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এদিক দিয়ে সমষ্টিকে خبائث বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়।

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ — من قبل এর অর্থ ইবরাহীম ও লূত (আঃ)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নূহ (আঃ)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন ঃ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا —অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, পৃথিবীর বুকে কোন কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় যখন কোনরূপেই তাঁর উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন, اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ —অর্থাৎ, আমি অপারগ ও অক্ষম হয়ে গেছি, আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ - كرب عظيم (মহাসংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ (আঃ) ও তাঁর পরিবার-বর্গের প্রতি চালাত।

نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ -অভিধানে نفش শব্দের অর্থ রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ - فَفَهَّمْنٰهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ মোকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ বিভিন্ন তফসীরে বর্ণিত রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আঃ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সুলায়মান (আঃ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয়পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহ্‌র কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ঃ দুই লোক হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও

অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবতঃ বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ (আঃ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পন করুক। (কেননা, ফেকাহ্‌র পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কেয়াম' অর্থাৎ, যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেয়া হয়েছে।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দেয়। হযরত সুলায়মান বললেন ঃ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়পক্ষের জন্যে উপকারী হত। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ বললেন ঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্যে উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান বললেন ঃ আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন শস্যক্ষেত্র ক্ষেতের মালিককে এবং ছাগ পাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হযরত দাউদ (আঃ) এই রায় পছন্দ করে বললেনঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায়দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন ঃ এখানে প্রশ্ন হয়, দাউদ (আঃ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান (আঃ)- এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? যদি হযরত দাউদ নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কি না? কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন খেলার বস্তুতে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয, বরং উত্তম। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আবু মূসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন।— (কুরতুবী সংক্ষেপিত)

পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ্ ঃ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ – হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যবুর পাঠ করতেন, তখন পক্ষীকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তসবীহ্ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তসবীহ্‌র আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ্ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন একটি মু'জেযা। মু'জেযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মু'জেযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু মূসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। আবু মূসা যখন জানতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর তেলাওয়াত শুনেছেন, তখন আরয করলেন ঃ আপনি শুনছেন— একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম।— (ইবনে-কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার ক্বারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া উচিত। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়ব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিক্ষা দান করা হয়েছিল ঃ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ – অস্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানে তাকেই لباس বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হেফাযতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ – অর্থাৎ, আমি দাউদের জন্যে লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত। তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা-সরু করতে পারতেন। (দুই) আগুনে গালিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গম্বরগণের কাজ ঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আঃ)-কে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেয়া হয়েছে যে, لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ অর্থাৎ, যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ম তরবারির আঘাত থেকে হেফাযত করে। এই প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ্ তাআলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা

শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে; যেমন দাউদ (আঃ) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (আঃ) বলেন ঃ যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মূসা –জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফেরআউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে। সূরা তোয়াহায় মূসা (আঃ)–এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলায়মান (আঃ)–এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা ঃ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন সুলায়মান (আঃ)–এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তিনি এর মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে দেন। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি একাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً – এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যেমন দাউদ (আঃ)–এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াজের সাথে তসবীহ্ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আঃ)–এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, দাউদ (আঃ)–এর বশীভূতকরণের মধ্যে مع (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে ل (জন্যে) বর্ণ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীভূতকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আঃ) যখন তেলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তসবীহ্ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্যে অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আঃ)–এর জন্যে বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে তার বিশাল সিংহাসন এবং লোক লস্করসহ সেখানে পৌঁছে দিত; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত।—(রূহুল–মা'আনী, বায়যাভী)

তফসীর ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আঃ)–এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আঃ) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য–সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হত, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব অতিক্রম করত; অর্থাৎ, একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আঃ)–এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ আসন স্থাপন করা হত। এগুলোতে সুলায়মান (আঃ)–এর সাথে ঈমানদার মানুষ এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হত, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হত, পৌঁছে দিত। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আঃ) মাথা নত করে আল্লাহ্র যিকর ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডানে, বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন।— (ইবনে কাসীর)

عَاصِفَةً এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رخاء বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যাতে ধুলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ–সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যতঃ এই দু'টি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একমাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহ্র কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ–সংঘাত সৃষ্টি হত না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন পাখীরও কোনরূপ ক্ষতি হত না।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا
دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى
رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَ
مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾
وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ
ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ
اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ
مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّآ
اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ
الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۡ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا
لَهٗ زَوْجَهٗ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ
يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۭ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

(৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তাঁর জন্যে ডুবুরীর কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম। (৮৩) এবং স্মরণ করুন আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন ঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ ; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ। (৮৫) এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। (৮৬) আমি তাঁদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ। (৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেন ঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ; তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার। (৮৮) অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। (৯০) অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে জিন ও শয়তানকে বশীভূতকরণ ঃ

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ -অর্থাৎ, আমি সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত ; যেমন-অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে, يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ -অর্থাৎ, তারা সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরী করত। সুলায়মান তাদের অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

شَيٰطِيْنَ -শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝাবার জন্যে আসলে جن অথবা جنات শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়— কাফের, তাদেরকেই শয়তান বলা হয়। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন সুলায়মান (আঃ)-এর বশীভূত ছিল, কিন্তু মুমিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই সুলায়মান (আঃ)-এর নিদর্শনাবলী ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَيٰطِيْنَ তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি সুলায়মান (আঃ)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবতঃ এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা বরাবরই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার হেফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ঃ দাউদ (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ্ তাআলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন ; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। সুলায়মান (আঃ)- এর জন্যে দেখাও যায় না এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন ; যেমন বায়ু জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার শক্তি সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত।—(তফসীর কবীর)

আইয়্যুব (আঃ)-এর কাহিনী ঃ আইয়্যুব (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবই উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোন কারণে। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; বরং তাদের তুলনায় আরও অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলা আইয়্যুব (আঃ)-কে প্রথম দিকে অগাধ ধন-দৌলত,

সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসবই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি ভাগাড়ে অর্থাৎ, আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আঃ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আঃ)। [ইবনে-কাসীর] সাহায্য-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত-মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন। আইয়্যুব (আঃ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশী বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশী মজবুত; তার বিপদ এবং পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহ্‌র কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ্ তাআলা আইয়্যুব (আঃ)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন (যেমন দাউদ (আঃ)-কে শোকরের এমনি স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল)। বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইয়্যুব (আঃ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ যখন আইয়্যুব (আঃ)-কে অর্থকড়ি, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নেয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও এবাদতে আরও বেশী আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে আরয করেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

আইয়্যুব (আঃ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী ছিল না ঃ হযরত আইয়্যুব (আঃ) পার্থিব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার-আরযও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য নেয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়। (অথচ আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়।) অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলাবাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল— বেসবরী ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন ঃ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا -(আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্নরূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হল।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়্যুব (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হল ঃ পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরণা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তদ্দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়্যুব (আঃ) তদ্রূপই করলেন। ঝরণার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত-জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্ত-মাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করতঃ আবর্জনার স্তূপ থেকে একটু সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। একপাশে উপবিষ্ট আইয়্যুব (আঃ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইয়্যুব (আঃ) বললেন ঃ আমিই আইয়্যুব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন ঃ আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? আইয়্যুব (আঃ) আবার বললেন ঃ লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইয়্যুব। আল্লাহ্ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন।— (ইবনে-কাসীর)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কোরআনে وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন ঃ এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম।— (কুরতুবী)

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিন জন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস যে নবী ও রসূল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয় জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ তাঁর নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরগণের কাতারভুক্ত ছিলেন

না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জরীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা। (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে একত্রিত করে বললেন ঃ আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই ঃ সদাসর্বদা রোযা রাখা, এবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করতঃ সে বলল ঃ আমি এই কাজের জন্যে উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা' জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি সদাসর্বাদা রোযা রাখ, এবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্‌সা কর না? লোকটি বলল ঃ নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা' সম্ভবতঃ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেলেন না, তাই সেদিনকার মত তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হল। তখন হযরত ইয়াসা' তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখেন, শয়তান তার সাঙ্গোপাঙ্গদেরকে বলল ঃ যাও কোনরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল ঃ সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল ঃ তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হল এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? উত্তর হল ঃ আমি একজন বৃদ্ধ মযলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, সেই যুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেন ঃ আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্যে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মোকদ্দমার ফয়সালা করার জন্যে আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্যে গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে? উত্তর হল ঃ আমি একজন বৃদ্ধ মযলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল ঃ হুযুর, আমার শত্রুপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হল না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে জানালা পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ভেতর ঢুকলে কি ভাবে? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল ঃ আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা' নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। যুলকিফল শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন।—(ইবনে-কাসীর)

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলফিকল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবতঃ বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়তের পদও দান করেছিলেন।

وَذَا النُّوْنِ — হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ)-এর কাহিনী

কোরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আম্বিয়া, সূরা ছাফফাত ও সূরা নূনে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'ছাহেবুল-হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। নূন ও হুত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নূন ও ছাহেবুল-হুতের অর্থ মাছওয়ালা। ইউনুস (আঃ)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নূনও বলা হয় এবং ছাহেবুল-হুত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

ইউনুস (আঃ)-এর কাহিনী ঃ তফসীর ইবনে-কাসীরে আছে, ইউনুস (আঃ)-কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আযাব এসেই যাবে। (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জান যায় যে, আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এদিকে ইউনুস (আঃ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল।—(মাযহারী) এর ফলে ইউনুস (আঃ)-এর

প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলে ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আঃ)-এর নাম বের হল। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারী করা হল। এবারও ইউনুস (আঃ)-এর নামই বের হল। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারী করা হল। কিন্তু নাম ইউনুস (আঃ)-এরই বের হল। এই লটারীর কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ অর্থাৎ, লটারীর ব্যবস্থা করা হলে ইউনুস (আঃ)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্ তাআলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আঃ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্ তাআলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আঃ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয় ; সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে-কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ্ তাআলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি অসন্তোষের কারণ হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যতঃ এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না ; বরং আল্লাহ্র ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বরগণের সনাতন রীতি অনুযায়ী নিজের জনগোষ্ঠীকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যতঃ আল্লাহ্র নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোন ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহ্র অসন্তোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে ; বরং প্রাণ-নাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ধরপাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যদিও গোনাহ্ ছিল না, কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহ্র নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলে তজ্জন্যে ধৃত করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্র রোষে পতিত হন।

তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যতঃ তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আঃ)-এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাবদানের উদ্দেশে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশে ছিল ; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে ; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়।—(কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহে বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর দেখুন।

ذَهَبَ مُغَاضِبًا — অর্থাৎ, ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যতঃ এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা رب শব্দটিকে مُغَاضِبًا এর مفعول বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যও مغاضبا ربه অর্থাৎ, পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহ্র খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাত ঈমানের আলামত।—(কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ —অভিধানের দিক দিয়ে نقدر শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি قدرت ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে, তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না। বলাবাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন পয়গম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না । কারণ, এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়, এটা قدر ধাতু থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা ; যেমন এক আয়াতে রয়েছে اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে জুবায়র, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউনুস (আঃ) মনে করলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, তফসীরের অর্থে এটা قدر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আঃ) মনে করলেন, এব্যাপারে আমার কোন ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদাহ্, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

ইউনুস (আঃ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্যে, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্যে মকবুল ঃ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ — অর্থাৎ, আমি যেভাবে ইউনুস (আঃ)-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মুমিনকেও করে থাকি ; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ —মাছের পেটে পাঠকৃত হযরত ইউনুস (আঃ)-এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তাআলা তা কবুল করবেন।—(মাযহারী)

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ও বলেছিলেন ঃ অর্থাৎ, পুত্র পাই বা না পাই ; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ
جَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ
اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ ۭ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَ
حَرٰمٌ عَلٰي قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا
فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ
كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
حَصَبُ جَهَنَّمَ ۭ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَاۗءِ
اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۭ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيْهَا
زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ
لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰۗىِٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ
حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾

(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তার কামপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম। (৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের ; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর। (৯৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত; (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে ; হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম ; বরং আমরা গোনাহগারই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোযখের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। (৯৯) এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (১০০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোযখ থেকে দুরে থাকবে। (১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে।

বৈ নয়। কারণ, পয়গম্বরগণের আসল মনোযোগ আল্লাহ্ তাআলার দিকেই থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয়।

وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا —তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ, সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্ তাআলাকে ডাকে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা এবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে কবুল ও সওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় গোনাহ্ ও ত্রুটির জন্যে ভয়ও করে।—(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَحَرٰمٌ عَلٰي قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ —এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরীয়তগত অসম্ভব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'।

لَا يَرْجِعُوْنَ বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে لا অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্যে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ حرام শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে لا কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্যে দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী। — (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কেয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ

এখানে حتى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করছিলাম। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম ঃ আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য فُتِحَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ্ তাআলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কেয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ
الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ
لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا
فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ
الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا
لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾
قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ وَاِنْ اَدْرِيْٓ
اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ
الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾ وَاِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ
وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا
الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّعَشْرُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿١﴾

(১০৩) মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে ঃ আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (১০৪) সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। (১০৫) আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। (১০৬) এতে এবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (১০৭) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (১০৮) বলুন ঃ আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে? (১০৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন ঃ 'আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। (১১০) তিনি জানেন, যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না সম্ভবতঃ বিলম্বের মধ্যে তোমাদের জন্যে একটি পরীক্ষা এবং এক সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ। (১১২) পয়গম্বর বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

সূরা হজ্ব

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৭৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার।

হবে। সূরা কাহ্‌ফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

حَدَبٍ শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি — বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহ্‌ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ, তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের এবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ এবাদত তো হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ওযায়র (আঃ) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তফসীর কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে বলেই জিজ্ঞাসা করে না, না তারা সন্দেহের ও জওয়াবের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না। লোকেরা আরয করল ঃ আপনি কোন আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ আয়াতটি হলো এই,

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেরদের বিতৃষ্ণার অবধি থাকে না। তারা বলতে থাকে ঃ এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলেম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌঁছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন ঃ আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জওয়াব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন ঃ আমি বলতাম যে, খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়র (আঃ)-এর এবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফেররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হল যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ একথার জওয়াব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

অর্থাৎ, যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ অর্থাৎ, যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فزع اكبر ঃ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ (মহাত্রাস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্যে উত্থিত হবে। কারও কারও মতে

শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরবী বলেন ঃ শিঙ্গায় তিনবার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فزع اكبر বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফুৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সব কিছু ফানা হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মসনদে আবু ইয়া'লা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী, ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবু হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। — (মাযহারী)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ হযরত ইবনে আব্বাস سجل শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ প্রমুখও এই অর্থ করেছেন। ইবনে-কাসীর, ইবনে জরীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। كتب শব্দের অর্থ এখানে مكتوب অর্থাৎ, লিখিত আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশ-মণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। (ইবনে-কাসীর, রূহুল-মা'আনী) سجل সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদগণের কাছে এই রেওয়ায়েত গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বোখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা সপ্ত আকাশকে তাদের অর্ন্তবর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অর্ন্তবর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্ তাআলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে। — (ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ – زبور শব্দটি زبر এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে زبور বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذكر বলে তওরাত এবং زبور বলে তওরাতের পর অবতীর্ণ খোদায়ী গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে; যথা ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআন। — (ইবনে জরীর) যাহ্হাক থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ বলেন ঃ ذكر বলে লওহে মাহ্ফূয এবং زبور বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সকল খোদায়ী গ্রন্থই বোঝানো হয়েছে। বাজ্জাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন। — (রূহুল-মা'আনী)

الْأَرْضَ অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে এখানে ارض (পৃথিবী) বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবায়র, ইকরিমা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী বলেন ঃ কোরআনের অন্য আয়াতও এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ অর্থাৎ, সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মুমিন-কাফের সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কেয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কেয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। ইবনে আব্বাসের অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে ارض এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী — অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগণ হবে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। তবে এক সময় তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ পৃথিবী আল্লাহ্র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহ্ভীরুদের জন্যেই। অপর এক আয়াতে আছে وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা করবেন। আরও এক আয়াতে আছে.

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

—নিশ্চয় আমি আমার পয়গম্বরগণকে এবং মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কেয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণেরা একবার পৃথিবীর বৃহদংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী (আঃ)-এর যমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। — (রূহুল মাআনী, ইবনে কাসীর)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ – عالم শব্দটি عالمين এর বহু বচন। মানব, জিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সবার জন্যেই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহ্র যিকর ও এবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টজগতের সত্যিকার রূহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রূহ্ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কেয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্র যিকর ও এবাদত সব বস্তুর রূহ্, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব বস্তুর জন্যে রহমতস্বরূপ, তা আপনা-আপনি ফুটে উঠল। কেননা, দুনিয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকর ও এবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার দৌলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ انا رحمة مهداة আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত।—(ইবনে-আসাকির) হযরত ইবনে ওমরের বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেনঃ انا رحمة مهداة برفع قوم وخفض اخرين অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রহমত, যাতে (আল্লাহ্র আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং (আল্লাহ্র আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই।—(ইবনে-কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শেরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবেলায় জেহাদ করাও সাক্ষাত রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে।

সূরা আম্বিয়া সমাপ্ত

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَٰرَىٰ
وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾ وَمِنَ
النَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ
شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ
وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ
فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن
نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ
وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ
هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

(২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল ; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আযাব সুকঠিন। (৩) কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। (৪) শয়তান সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে। (৫) হে লোকসকল। যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ—) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি ; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সূরা হজ্ব

সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিকসংখ্যক তফসীরবিদগণ বলেন ঃ এই সূরাটি মিশ্র। এতে মক্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরতুবী এ উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন ঃ এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র্য এই যে, এর কিছু আয়াত রাত্রে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়,কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহ্‌কাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতাশাবিহ্ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলে করীম (সাঃ) উচ্চৈঃস্বরে এর তেলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ এই আয়াতে উল্লেখিত কেয়ামতের ভূকম্পন কোন্ দিন হবে তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)–কে সম্বোধন করে বলবেন ঃ যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বললেন ঃ এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আধিক্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে–কেরাম একথা শুনে ভীত–বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন ঃ তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ–মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবু সায়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ–মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায়। (তাই নয়শত নিরানব্বই এর মধ্যে বৃহত্তর সংখ্যা তাদেরই হবে।) তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে ঃ কেয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ কেয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে, যথা—

(১) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (২) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
(৩) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ইত্যাদি।

কেউ কেউ আদম (আঃ)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কেয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কেয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়,তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কেয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে।— (কুরতুবী)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ এই আয়াত কট্টর বিতর্ককারী নযর ইবনে হারেস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা এবং কোরআনকে বিগত লোকদের কল্পকাহিনী বলত। কেয়ামতে পুনরুত্থানও সে অস্বীকার করত।— (মাযহারী)

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরণের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ব্যাপক।

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা ঃ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বোখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয় ঃ (১) তার বয়স কত হবে, (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা।- (কুরতুবী)

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদেরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ্ তাআলাকে জিজ্ঞেস করে يارب مُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ অর্থাৎ, এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় غير مُخَلَّقَةٍ তবে গর্ভাশয়ে সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয়া হয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জওয়াবে مُخَلَّقَةٍ বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা; না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? এসব প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া হয়।— (ইবনে-কাসীর) مُخَلَّقَةٍ ও وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ শব্দদ্বয়ের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে।— (কুরতুবী)

مُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ উল্লেখিত হাদীস থেকে এই শব্দদ্বয়ের তফসীর এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানবসৃষ্টি অবধারিত হয়, তা مخلقة এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غير مخلقة কোন কোন তফসীরকারক مخلقة ও غير مخلقة এর এরূপ তফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে غير مخلقة অর্থাৎ, পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন ইত্যাদি অসম, সে غير مخلقة

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا অর্থাৎ, অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছে যায়। ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ এর অর্থ তাই। اشد শব্দটি شدة এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমে উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়।

اَرْذَلِ الْعُمُرِ সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা যায়। রসূলে করীম (সাঃ) এমন বয়স থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সা'দের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত আছে— রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন এবং সা'দ (রাঃ)-ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই ঃ

اللّٰهم انى اعوذبك من البخل واعوذبك من الجبن واعوذبك من ارد الى ارذل العمر واعوذبك من فتنة الدنيا وعذاب القبر .

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা ঃ মুসনাদে-আহ্মদ ও মুসনাদে আবু-ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লিখা হয় না এবং পিতা-মাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হেফাযত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্যে সঙ্গীয় দুইজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌছে যায়, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে পৌছলে সে আল্লাহ্র দিকে রুজুর তওফীক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ্ তাআলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ্ তাআলা তার অগ্র-পশ্চাতের সব গোনাহ্ মাফ করে দেন এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফাআত করার অধিকার দান করেন ও শাফাআত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় "আমীনুল্লাহ্ ও আসিরুল্লাহ্ ফিল আরদ্ব" অর্থাৎ, পৃথিবীতে আল্লাহ্র বন্দী।

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ
فِى الْقُبُوْرِ ۝٧ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝٨ ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٩ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٠ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ
فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى
وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝١١
يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۭ ذٰلِكَ هُوَ
الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝١٢ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۭ
لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۝١٣ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝١٤ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ
يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى
السَّمَاۗءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ۝١٥

(৭) এবং এ কারণে যে,কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (৮) কতক মানুষ জ্ঞান; প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (৯) সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্যে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। (১০) এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। (১১) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্র এবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথভ্রষ্টতা। (১৩) সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী। (১৪) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে,আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে যে, আল্লাহ্ কখনই ইহকালে ও পরকালে রসূলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক, এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কি না।

কেননা, এই বয়সে সাধারণতঃ মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোন কিছুতে ঔৎসুক্য বাকী থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন যাপন করে। অতঃপর মানুষ যখন 'আরযালে ওমর' তথা নিষ্কর্মা বয়সে পৌঁছে যায়,তখন সুস্থ ও শক্তিবান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লিখা হয় এবং কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثَانِىَ عِطْفِهٖ – عطف শব্দের অর্থ পার্শ্ব। অর্থাৎ, পার্শ্ব পরিবর্তনকারী। এখানে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বোঝানো হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হিযরত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলত ঃ এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলত ঃ এই ধর্ম মন্দ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে? বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধন-সম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাস্বরূপ কোন বিপদাপদ ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শত্রু চায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপ শত্রুদের বোঝে নেয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের পদ বিলুপ্ত করে দেয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা যাঁকে নবুওয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূল ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত,যাতে নবুওয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনরূপে আকাশে পৌঁছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলাবাহুল্য, কারও পক্ষে আকাশে যাওয়া ও আল্লাহ্ তাআলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি? এই তফসীর হুবহু দুররে-মনসূর গ্রন্থে ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তফসীর। – (বয়ানুল-কোরআন- সহজকৃত)।

কুরতুবী এই তফসীরকেই আবু জা'ফর নাহ্হাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এটা সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আব্বাস থেকেও এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى
وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَ
الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاۗبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۭ وَكَثِيْرٌ حَقَّ
عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۭ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ﴿١٨﴾ ۩ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۣ
فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصَبُّ مِنْ
فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾
وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا
مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۣ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾
اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ
اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۭ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾

(১৬) এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াতরূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ্‌-ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। (১৭) যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরেক, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহ্‌র দৃষ্টির সামনে। (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্‌কে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্‌ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা তাই করেন। (১৯) এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। (২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। (২১) তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। (২২) তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ দহনশাস্তি আস্বাদন কর। (২৩) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী।

যে, এখানে سماء বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ; যদি কোন মূর্খ শত্রু কামনা করে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এছাড়া কিছুই নেই যে, সে তার ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক।—(মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র সৃষ্টবস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ ঃ সমগ্র সৃষ্টজগত স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার ; (১) সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, জীবিত, মৃত, জড়পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। (২) সৃষ্টজগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ, স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ্‌ তাআলার বিধানাবলী মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে তারা কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সেজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয় ; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন সৃষ্টবস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কম-বেশী এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ্‌ তাআলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণস্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্টবস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেয়া হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণতঃ অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়, কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে,তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কাজেই আলোচ্য আয়াতে সে আনুগত্যকে সেজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্টবস্তু স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে সেজদা করে অর্থাৎ, আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—(এক) মুমিন, অনুগত ও সেজদাকারী এবং (দুই) কাফের, অবাধ্য ও সেজদার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। সেজদার তওফীক না দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন।

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا আয়াতে উল্লেখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফের দল ; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সে দুই পক্ষ সম্পর্কে

অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী, হামযা, ওবায়দা (রাঃ) ও কাফেরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভ্রাতা শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফের পক্ষের তিন জনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পায়ের কাছে প্রাণত্যাগ করেন। আয়াত যে এই সম্মুখযোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যতঃ এই হুকুম তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— যে কোন যমানার উম্মত হোক না কেন।

জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানোর রহস্য ঃ এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্যে একে দোষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহ্দের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে গ্রেফতার করার জন্যে সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহ্র হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবী করে বসে এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে, কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেন ঃ জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে— স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।— (কুরতুবী)

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম ঃ আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা,পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলাবাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযার ও বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে; জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরী হবে।— (মাযহারী)

ইমাম নাসায়ী হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الاخرة ومن شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الاخرة ومن شرب فى انية الـذهـب والفضة لم يشرب فيها فى الاخرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس اهل الجنة وشراب اهل الجنة وانية اهل الجنة .

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।— (কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে; যেমন— আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে।— (কুরতুবী)

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোন বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করারও উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্নস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোন কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না।

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَٰطِ
ٱلْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ
فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا
تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَ
ٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا
مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾
ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ
وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَنِبُوا
ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

(২৪) তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহ্র পথপানে। (২৫) যারা কুফর করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্যে সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। (২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্যে, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে। (২৭) এবং মানুষের মধ্যে হজ্বের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (২৯) এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে। (৩০) এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহ্র সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম। উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক;

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ এখানে কলেমায়ে তাইয়্যেবাহ্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে।—(কুরতুবী)

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ - سَبِيلِ ٱللَّهِ (আল্লাহ্র পথ) বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ্। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে-হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় মসজিদে-হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয় ; যেমন— আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি ; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ্ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কোরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে-হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে ঃ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

তফসীরে দুররে-মনসূরে এস্থানে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে; আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য ঃ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজ্বের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়; যেমন— ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান, এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে সাধারণ ওয়াকফ। কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনও হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফেকাহ্বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফেকাহ্বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফেকাহ্বিদগণের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া জায়েয। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে ওমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে এ ব্যাপারে উপরোক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী।— (রুহুল-মা'আনী) ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়।

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ অভিধানে الحاد এর অর্থ সরল পথ

থেকে সরে যাওয়া। এখানে 'এলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহর মতে কুফর ও শেরক। কিন্তু অন্য তফসীরকারকগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গোনাহ্ ও আল্লাহ্র নাফরমানী এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, চাকরকে গালি দেয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা বলেন ঃ 'হেরেমে এলহাদ' বলে এহ্রাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ— এমন কোন কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন— হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোন বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গোনাহ্ এবং আযাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই যে, মক্কার হেরেমে সৎকাজের সওয়াব যেমন বেশী হয় তেমনি পাপকাজের আযাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়।— (মুজাহিদের উক্তি)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এই আয়াতের এক তফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়, কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গোনাহ্ লিখা হয়। কুরতুবী এই তফসীরই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর হজ্ব করতে গেলে দু'টি তাঁবু স্থাপন করতেন— একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন কারণে শাসন করার প্রয়োজন হত, তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে একাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় لا والله অথবা بلى والله ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'এলহাদ' করার শামিল।— (মাযহারী)

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সূচনা ঃ وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অভিধানে بوأ শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেয়া। আয়াতের অর্থ এই ঃ একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে বায়তুল্লাহ্র অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ الْبَيْتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ ইবরাহীম (আঃ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আঃ)-ও তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতেন। নূহ (আঃ)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহ্র প্রাচীর উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেয়া হয় ঃ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا অর্থাৎ, আমার এবাদতে কাউকে শরীক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আঃ) শেরক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। তাঁর মূর্তি সংহার, মুশরেকদের মোকাবেলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটেছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে শোনানো উদ্দেশ্য, যাতে তারা শেরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেয়া হয় وَطَهِّرْ بَيْتِيَ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু বায়তুল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয়; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ্ বলা হয়। এই ভূখণ্ডে সবসময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করত।– (কুরতুবী) এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শেরক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক ময়লা আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। ইবরাহীম (আঃ)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ, ইবরাহীম (আঃ) নিজেই একাজ করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে একাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্র হজ্ব তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।– (বগভী) ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে হজ্ব ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে আরয করলেন ঃ এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই ; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে? আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম (আঃ) মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ্ তাআলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবু কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন ঃ লোক সকল, তোমাদের পালনকর্তা নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ্ব ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছে দেয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তাআলা হজ্ব লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে لبيك اللهم لبيك বলেছে অর্থাৎ, হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ইবরাহিমী আওয়াজের জওয়াবই হচ্ছে হজ্বে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি।– (কুরতুবী, মাযহারী)

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণে কেয়ামত পর্যন্তের জন্যে কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, يَّاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ অর্থাৎ, বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহ্র দিকে চলে আসবে ; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে, বায়তুল্লাহ্র পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা (আঃ)-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে,

তাতেও আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজ্বের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম (আঃ) থেকে বর্ণিত ছিল।

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ অর্থাৎ, দূর-দুরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে نكرہ منافع শব্দটি ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজ্বের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয় হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে, কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ্ব অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন, বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃস্ব ও ফকীর হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তাআলা হজ্ব ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন ব্যক্তি পার্থিব দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না। বরং কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ্ব-ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজ্বের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কল্যাণটি কোন অংশে কম নয়। আবু হোরায়রার এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে হজ্ব করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহের কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্ব থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে; অর্থাৎ, জন্মের অবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রূপই হয়ে যায়।— (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী)

বায়তুল্লাহ্র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হল যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে— وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ অর্থাৎ, যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত, বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র যিকর, যা এই দিনগুলোতে কোরবানী করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই এবাদতের প্রাণ। কোরবাণীর গোশত তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নেয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী করা জায়েয,অর্থাৎ, যিলহজ্ব মাসের ১০,১১ ও ১২ তারিখ। مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ এর অর্থ ব্যাপক; ওয়াজিব হোক কিংবা মোস্তাহাব সব রকম কোরবানী এর অন্তর্ভুক্ত।

فَكُلُوا مِنْهَا এখানে كلوا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা; যেমন— কোরআনের وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। এহ্রাম অবস্থায় চুল মুণ্ডানো, কাটা, উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নীচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্বের কোরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দুর করে দাও। অর্থাৎ, এহ্রাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নীচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কোরবানী ও পরে এহ্রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ত্রুটিজনিত কোরবানী করতে হবে।

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ - نذور শব্দটি نذر এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি একাজ করব অথবা আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জন্যে একাজ করা জরুরী তবে একেই নযর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও মূলতঃ তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে কাজটি গোনাহ্ ও নাজায়েয না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গোনাহ্র কাজের মানত করে, সেই গোনাহ্র কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফ্ফারা আদায় করা জরুরী হবে। আবু হানীফা (রহঃ) প্রমুখ ফেকাহ্বিদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট এবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত; যেমন— নামায, রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। অতএব যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

মাসআলা ঃ স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ উচ্চারণ না করে। তফসীরে-মাযহারীতে এস্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে-যেয়ারত বোঝানো হয়েছে, যা যিলহজ্বের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানীর পর করা হয়। এই তওয়াফ হজ্বের দ্বিতীয় রোকন ও ফরয। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরও পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে-যেয়ারতের পর এহ্রামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ এহ্রাম খুলে যায়।- (রূহুল-মা'আনী

بيت عتيق - عتيق শব্দের অর্থ মুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর গৃহের নাম بيت عتيق রেখেছেন ; কারণ আল্লাহ্ একে কাফের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।— (রূহুল-মা'আনী) কোন কাফেরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তী-বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ
مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
مَحِلُّهَاۤ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ
فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾
الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى
مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾
وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖۗ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا
دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا
لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

(৩১) আল্লাহ্‌র দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে; এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহ্‌র নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহ্‌ভীতিপ্রসূত। (৩৩) চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্যে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোকে পৌঁছাতে হবে মুক্ত গৃহ পর্যন্ত। (৩৪) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্‌র দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ্ তো একমাত্র আল্লাহ্ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও; (৩৫) যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৬) এবং কা'বার জন্যে উৎসর্গীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবেহ্ করার সময় তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাচ্ঞা করে না তাকে এবং যে যাচ্ঞা করে তাকে। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

حُرُمٰتِ اللّٰهِ –বলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ - انعام –বলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো এহ্‌রাম অবস্থায়ও হালাল। اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ –বাক্যে যেসব জন্তু ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, মৃত জন্তু, যে জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম–এহ্‌রাম অবস্থায় হোক কিংবা এহ্‌রামের বাইরে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ - رجس শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা اوثان শব্দটি وثن এর বহুবচন; অর্থ মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে; কারণ ; এরা মানুষের অন্তরকে শেরকের অপবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ - قول زور –এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থী, তাই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। শেরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেন–দেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বৃহত্তম কবীরা গোনাহ্ এগুলো ঃ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা–মাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ قَوْلَ الزُّوْرِ কে বার বার উচ্চারণ করেন। – (বোখারী)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ - شَعَآئِرَ শব্দটি شعيرة – এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোন বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার شَعَآئِر বলা হয়। সাধারণের পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে শা'আয়েরে–ইসলাম' বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ বিধান তদ্রূপই।

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ –অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক খোদাভীতির লক্ষণ যার অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি থাকে, সে–ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে খোদাভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى –অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্যে তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত এগুলোকে হরম শরীফে যবেহ্ করার জন্যে উৎসর্গ না কর। হজ্জ অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি যবেহ্ করার জন্যে যে জন্তু সাথে নিয়ে যায় তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোন জন্তুকে হরমের হাদী হওয়ার জন্যে উৎসর্গ করা হয় তখন তা থেকে কোন উপকার লাভ

করা বিশেষ কোন অপারগতা ছাড়া জায়েয নয়। যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জন্তু না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্যে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারগতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে।

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ –এখানে بيت عتيق (সম্মানিত গৃহ) বলে সম্পূর্ণ হরম বোঝানো হয়েছে। হরম বায়তুল্লাহ্‌রই বিশেষ আঙিনা; যেমন—পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে-হারাম' বলে হরম বোঝানো হয়েছে। محل অর্থাৎ, মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে যবেহ্ করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু যবেহ্ করার স্থান বায়তুল্লাহ্‌র সন্নিকট; অর্থাৎ, সম্পূর্ণ হরম। এতে বোঝা গেল যে, হরমের ভিতরে হাদী যবেহ্ করা জরুরী, হরমের বাইরে জায়েয নয়। হরম মিনার কোবান গাহ্‌ও হতে পারে; মক্কা মোকাররমার অন্য কোন স্থানও হতে পারে। –(রূহুল-মা'আনী)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا –আরবী ভাষায় منسك ও نسك কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জন্তু কোরবানী করা, (দুই) হজ্বের ক্রিয়াকর্ম এবং (তিন) এবাদত। কোরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিন অর্থই হতে পারে। এ কারণেই তফসীরকারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে منسك –এর অর্থ কোরবানী নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কোরবানীর যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কোরবানীর আদেশ দেয়া হয়েছিল। কাতাদাহ্ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজ্বের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ্ব ফরয করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র এবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরয করেছিলাম। এবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল, কিন্তু মূল এবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ –আরবী ভাষায় خبت শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خبيت বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ জন্যেই কাতাদাহ্ ও মুজাহিদ مخبتين –এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমর ইবনে-আস বলেন ঃ এমন লোকদেরকে مخبتين বলা হয়, যারা অন্যের উপর জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান বলেন ঃ যারা সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও তকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مخبتين

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ – وجل –এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি, যা কারও মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বন্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার যিকর ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ –পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও এবাদতকে شعائر বলা হয়। কোরবানীও এমন বিধানাবলীর অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

صَوَافَّ –শব্দের অর্থ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ সারিবদ্ধভাবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কোরবানী করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় যবেহ্ করা সুন্নত।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا –এখানে وجبت –এর سقطت যেমন বাকপদ্ধতিতে বলা হয় الشمس وجبت অর্থাৎ, সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ –যাদেরকে কোরবানীর গোশত দেয়া উচিত। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে بائس বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তদস্থলে قانع ও معتر শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তফসীর করা হয়েছে। قانع ঐ অভাবগ্রস্ত ফকীরকে বলা হয়, যে কারও কাছে যাঞ্চা করে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে معتر ঐ ফকীরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে—মুখে সওয়াল করুক বা না করুক।— (মাযহারী)

এবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য ঃ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا –বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কোরবানী একটি মহান এবাদত ; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এর গোশ্‌ত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কোরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্যান্য সব এবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাযে উঠা-বসা করা, রোযায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত এবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু এবাদতের শরীয়তসম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরী যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্যে এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم
بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ
وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ
مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ
لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا
تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

(৩৮) আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। (৩৯) যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (৪০) যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, এবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। (৪১) তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত। (৪২) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নূহ, আদ, সামূদ, (৪৩) ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায়ও (৪৪) এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকেও। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম। (৪৫) আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহ্গার। এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে। (৪৬) তারা কি এই উদ্দেশে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রথম আদেশ ঃ মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) জওয়াবে বলতেন ঃ সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল।—(কুরতুবী)

যখন রসূলে করীম (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়- اخرجوا نبيهم ليهلكن অর্থাৎ এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।-(কুরতুবী)

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাইয়্যান, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এই প্রথম আয়াত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হল। ইতিপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জেহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য ঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ -এতে জেহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোন মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ -বিগত যমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শেরকে পরিণত হয়েছে, সেসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যমনায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুওয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেমন-অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের এবাদতখানা কোন সময়ই সম্মানার্হ ছিল না।

صَوَامِعُ -শব্দটি صومعة এর বহুবচন। এটা খ্রীষ্টানদের সংসার ত্যাগী দরবেশদের বিশেষ এবাদতখানা। وَبِيَعٌ শব্দটি بيعة এর বহুবচন। খ্রীষ্টানদের সাধারণ গির্জাকে بيعة বলা হয়। وَصَلَوَاتٌ শব্দটি صلوت এর বহুবচন। ইহুদীদের এবাদতখানাকে وَصَلَوَاتٌ এবং মুসলমানদের এবাদতখানাকে وَمَسَاجِدُ বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা (আঃ)-এর আমলে وَصَلَوَاتٌ, ঈসা (আঃ)-এর আমলে صَوَامِعُ ও وَبِيَعٌ এবং

শেষনবী (সাঃ)–এর যমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। — (কুরতুবী)

খোলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার প্রকাশ ঃ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ এই আয়াতে তাদেরই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে,যাদের বর্ণনা اِلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ আয়াতে ছিল ; অর্থাৎ, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেনঃ ثناء قبل بلاء অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার এই এরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা-কীর্তন করার শামিল। এরপর আল্লাহ্ তাআলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। চার জন খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং মুহাজিরগণ اِلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। তাঁরা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎকাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

এ কারণেই আলেমগণ বলেন ঃ এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খোলাফায়ে-রাশেদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্যপাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল।— (রূহুল-মা'আনী)

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলাবাহুল্য কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না ; বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন ঃ এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমনসব কর্ম আনজাম দেয়া উচিত, যেগুলো খোলাফায়ে-রাশেদীন তাদের যমানায় আনজাম দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী)

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য ঃ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ –এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ –বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীতকাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেযমীনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত্তাফাক্কুরে মালেক ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)–কে আদেশ দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরী কর এবং আল্লাহ্র পৃথিবীতে এত গোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায়।—(রূহুল-মা'আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

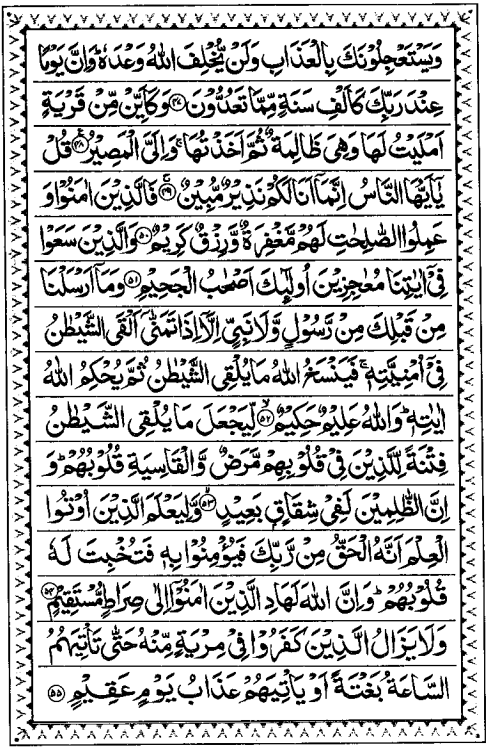

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا
عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ
أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۖ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْ
فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ
فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ
آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَ
إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ
قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

(৪৭) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান (৪৮) এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা গোনাহগার ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৯) বলুনঃ হে লোক সকল! আমি তো তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী (৫০) সুতরাং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে আছে পাপ মার্জনা এবং সম্মানজনক রুযী। (৫১) এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে চেষ্টা করে, তারাই দোযখের অধিবাসী। (৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়, (৫৩) এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষাণহৃদয়। গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে; (৫৪) এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে; তারা যেন জানে যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহ্ই বিশ্বাসস্থাপনকারীকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৫৫) কাফেররা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কেয়ামত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য ঃ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ –অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। অনেক তফসীরকারক এখানে এই অর্থই নিয়েছেন।

বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোন কোন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি ; আরও বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে আল্লাহ্র একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।—(মাযহারী)

তফসীরের সার–সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অর্থটি كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ সূরা মা'আরেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই – এতেও উপরোক্ত উভয় প্রকার তফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম–বেশী হবে, তাই দিনটি কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়; অর্থাৎ, এক আয়াতে এক হাজার এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে।

مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ –এ থেকে জানা যায় যে, রসূল ও নবী এক নয় পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের উদ্দেশে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবুওয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে—তাঁকে কোন স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হোক বা কোন পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত মূসা, ঈসা (আঃ) ও শেষনবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। এবং যিনি পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট , তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত হারূন (আঃ)। তিনি মূসা (আঃ)–এর কিতাব তওরাত ও তাঁরই শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। 'রসূল' তাঁকে বলা হয়, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রসূল হবেন তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরী; কিন্তু যিনি নবী হবেন তাঁর রসূল হওয়া জরুরী নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রসূল বলা এর পরিপন্থী নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৫৬) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্‌রই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারা নেয়ামতপূর্ণ কাননে থাকবে (৫৭) এবং যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে। (৫৮) যারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক দাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌঁছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, সহনশীল। (৬০) এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৬১) এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্ই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহ্ই সবার উচ্চে, মহান। (৬৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবরদার। (৬৪) নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী।

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ –আয়াতে يمنى শব্দের অর্থ قرأ (আবৃত্তি করে) এবং امنية শব্দের অর্থ قراءة অর্থাৎ, আবৃত্তি করা। আরবী অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে এবং আরও অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রন্থাদিতে এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা "গারানিক" নামে খ্যাত। অধিকসংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মদ্রোহীদের আবিষ্কার বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, তাঁরা সেসব সন্দেহের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের তফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তফসীরের অংশ সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপৃত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠের সব কিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেয়ারই নামান্তর। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে تسخير এর তরজমা "কাজে নিয়োজিত করা" দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেয়ার শক্তিও আল্লাহ তাআলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্যে ক্ষতিদায়ক হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। একজন নদীকে একদিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্যজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হত না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌঁছে দিয়েছেন।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا –এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে منسك শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে نسك ও منسك কোরবানীর অর্থে হজ্বের বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছিল। এজন্যে সেখানে واو সহকারে وَلِكُلِّ أُمَّةٍ বলা হয়েছিল। এখানে منسك এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ, যবেহ্ করার বিধানাবলী অথবা শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে واو সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের তফসীরের সার-সংক্ষেপ এই যে, কোন কোন কাফের মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ্ করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করত। তারা বলত ঃ তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক যে, যে

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ
إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي
أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي
الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾
وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ
يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ
النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

(৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ্ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চিয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। (৬৭) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন। (৬৮) তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। (৭০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহ্র কাছে সহজ। (৭১) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে, যার কোন সনদ নাযিল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭২) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফেরদের চোখে-মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে উঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা আগুন ; আল্লাহ্ কাফেরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ তাআলা সরাসরি মৃত্যুদান করেন অর্থাৎ, সাধারণ মৃতজন্তু তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(রূহুল মা'আনী) অতএব এখানে منسك এর অর্থ হবে যবেহ্ করার নিয়ম। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মত ও শরীয়তের জন্যে যবেহ্র বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর শরীয়ত একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মোকাবেলা কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েয নয়; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর মোকাবেলা করছ। এটা কিরূপে জায়েয হতে পারে? মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে পয়গম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা।—(রূহুল মা'আনী) সাধারণ তফসীরকারকদের মতে منسك শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা, অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্যে নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজ্বের বিধি-বিধানকে مناسك الحج বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে নির্ধারিত আছে। (ইবনে-কাসীর) কামূসে نسك শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে এবাদত। কোরআনে وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مناسك বলে এবাদতের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এই দ্বিতীয় তফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, منسك বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরেক ও ইসলামবিদ্বেষীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা কি শোনেনি যে, কোন পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরীয়ত ও কিতাবের মোকাবেলা করা বাতিল। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোন উম্মত ও শরীয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্যে বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরীয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরীয়তের কোন বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসেখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরীয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ-এর সারমর্মও তাই। অর্থাৎ, বর্তমানকালে যখন শেষনবী (সাঃ) একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরীয়তের সব বিধি-বিধান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার অধিকার কারও নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় তফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াত যবেহ্ সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে-অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয়

يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ
اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ
مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ
حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ
الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَ
اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ هُ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

(৭৩) হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশীল। (৭৫) আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা। (৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৮) তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

তফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তাআলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নেই যে, নতুন শরীয়ত সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করবে; বরং নূতন শরীয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্ক-বিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ, আপনি সত্য ও সরল পথে রয়েছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের কারণ ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত মনসুখ হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রীষ্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরীয়ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কোরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরীয়ত দেয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরও ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন। وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা ঃ ضُرِبَ مَثَلٌ – এই শব্দটি সাধারণতঃ কোন বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শেরক ও মূর্তিপূজার বোকামী একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফল-মূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামী ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশী শক্তিহীন হবে। مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহ্‌র মর্যাদা বোঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন

ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে।

সূরা হজ্বের সেজদায়ে-তেলাওয়াত ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ –সূরা হজ্বে এক আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব। এখানে উল্লেখিত আয়াতে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-এর মতে এই আয়াতে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে সেজদার সাথে রুকূ ইত্যাদিও উল্লেখিত হয়েছে। এতে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে নামাযের সেজদা বোঝানো হয়েছে, যেমন وَاسْجُدِي وَارْكَعِي আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাযের সেজদা উদ্দেশ্য। এই আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে, এই আয়াতেও সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা হজ্ব অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দু'টি সেজদায়ে তেলাওয়াত আছে। ইমাম আযামের মতে, এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ্ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ – جهاد ও مجاهدة শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্যে কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জেহাদ বলা হয়। حَقَّ جِهَادِهِ এর অর্থ আল্লাহ্র ওয়াস্তে জেহাদ করা, তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ حَقَّ جِهَادِهِ এর অর্থ জেহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোন কোন তফসীরকারকের মতে এখানে জেহাদের অর্থ সাধারণ এবাদত ও আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তা পালন করা।

যাহ্হাক ও মোকাতিল বলেন ঃ
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র জন্যে কাজ কর, যেমন করা উচিত এবং আল্লাহ্র এবাদত কর, যেমন করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেন ঃ এস্থলে জেহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই حَقَّ جِهَادِهِ অর্থাৎ, যথাযোগ্য জেহাদ। ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে-কেরামের একটি দল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ

তোমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ এখনও অভ্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য ঃ তফসীরে-মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে তা এই যে, সাহাবায়ে-কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ তখনও চালু ছিল, কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু স্বভাবতঃই এই জেহাদ শায়খে-কামেলের সংসর্গলাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্র মনোনীত উম্মত ঃ هُوَ اجْتَبَاكُمْ –হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বনী-ইসরাঈলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কোরাইশকে, অতঃপর কোরাইশের মধ্য থেকে বনী-হাশেমকে এবং বনী-হাশেমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। –(মুসলিম, মাযহারী)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ –অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই'—এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোন গোনাহ্ নেই, যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহ্ও ছিল, যা তওবা করলেও মাফ হত না।

হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ তফসীরে-মাযহারীতে বলেন ঃ ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, একথার তাৎপর্য এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্য থেকে নিজের জন্যে মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্যে ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষতঃ অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ جعلت قرة عينى فى الصلوٰة –অর্থাৎ, নামাযে আমার চক্ষু শীতল হয়। –(আহমদ, –নাসায়ী, হাকিম)

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ –অর্থাৎ, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। এরপর কোরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফযীলতে শামিল হয়; যেমন-হাদীসে আছে ঃ
সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কোরাইশদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান কোরাইশীদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কোরাইশীদের অনুগামী। –(মাযহারী)

কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম (সাঃ) হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা; যেমন তাঁর বিবিগণ 'উম্মাহাতুল-মুমেনীন' অর্থাৎ, মুমিনদের মাতা। নবী করীম (সাঃ) যে, হযরত ইবরাহীমের বংশধর; একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا –অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম

(আঃ) কোরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন; যেমন হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ –কোরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম নন, কিন্তু কোরআনের পূর্বে তাঁর এই নামকরণ কোরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও ইবরাহীম (আঃ)–এর দিকে করে দেয়া হয়েছে।

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

–অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম তখন উম্মতে-মহাম্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর যখন এই দাবী করবেন, তখন তাঁদের উম্মতরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে–মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গম্বরগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্ তাআলার বিধানাবলী পৌঁছে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের যমানায় উম্মতে–মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে? উম্মতে–মুহাম্মদীর তরফ থেকে জেরার জওয়াবে বলা হবে ঃ আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের রসূল (সাঃ)–এর মুখে একথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বোখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে।

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ –উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্র বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। বিধানাবলীর মধ্যে এস্থলে শুধু নামায ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ –অর্থাৎ, সবকাজে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এই বাক্যের অর্থ এই যে, কোরআন ও সুন্নাহ্কে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়ে থাক; যেমন এক হাদীসে আছে ঃ

আমি তোমাদের জন্যে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু'টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নত।–(মাযহারী)

সূরা হজ্ব সমাপ্ত

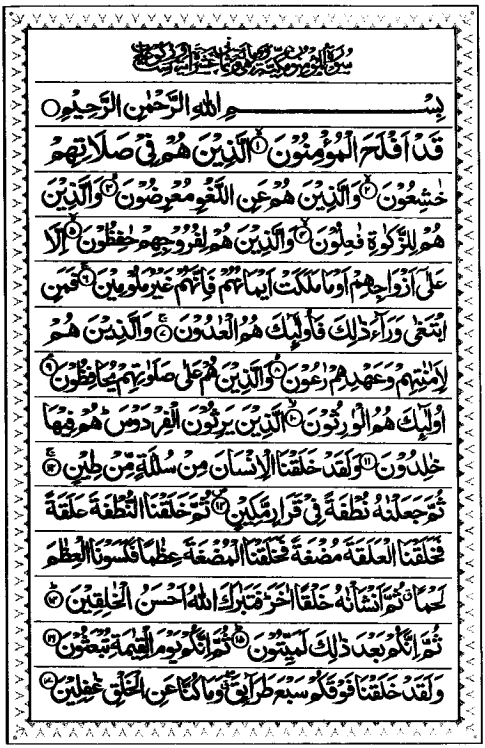

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ
خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ
هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا
عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ
ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ۝١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢
ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ
لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٤
ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝١٦
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝١٧

সূরা আল মু'মিনূন

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র; (৩) যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, (৪) যারা যাকাত দান করে থাকে (৫) এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। (৬) তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৭) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। (৮) এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে (৯) এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৬) অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর সপ্তপথ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধান নই।

সূরা আল মু'মিনূন

সূরা মু'মিনূনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মুসনাদে-আহ্‌মদের এক রেওয়ায়েতে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্যে থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে লাগলেন ঃ

اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا .

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্ আমাদেরকে বেশী দাও—কম দিও না। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর—লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর—বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অধিকার দাও—অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ো না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কর।" এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এক্ষণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি উপরোল্লেখিত দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায় ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ তাঁর চরিত্র অর্থাৎ, স্বভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এগুলোই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র ও অভ্যাস।—(ইবনে-কাসীর)

সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (সাফল্য) শব্দটি কোরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আযান ও একামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহ্বান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া।—(কামুস) এই শব্দটি যেমনি সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোন মানুষ এর চাইতে বেশী কোনকিছু কামনাই করতে পারে না। বলাবাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা—এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতে কোন মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ্ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও পয়গম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোন কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারও জন্যে সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নেয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের খট্‌কা এবং যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা

প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে।— وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ, তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই একথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۭ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۨ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন, যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন।" এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হল। কোরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ, যে নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রেখেছে সে সাফল্যলাভ করেছে। এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে ঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক; অথচ পরকাল উত্তমও; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে-দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ, সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা-এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বন্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা সেসব মুমিনকে সাফল্যদান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণ ঃ সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সে সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই ঃ

প্রথম, নামাযে 'খুশূ' তথা বিনয়-নম্র হওয়া—'খুশূ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ, অনর্থক নড়াচড়া না করা।—(বয়ানুল-কোরআন) বিশেষতঃ এমন নড়াচড়া, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফেকাহ্‌বিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া 'নামাযের মাকরূহ্‌সমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে খুশূর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশূর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলতঃ অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণতঃ হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশূ। হযরত আতা বলেন ঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা 'খুশূ'। হাদীসে হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ নামাযের সময় আল্লাহ্ তাআলা বন্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্য কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।—(আহমদ, নাসায়ী আবু দাউদ—মাযহারী) নবী করীম (সাঃ) হযরত আনাসকে নির্দেশ দেন ঃ সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে-বামে ভ্রূক্ষেপ করো না।—(বায়হাকী-মাযহারী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه – অর্থাৎ, এই ব্যক্তির অন্তরে খুশূ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা থাকত।—(মাযহারী)

পূর্ণ মুমিনের দ্বিতীয় গুণ ঃ অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ –এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তরের গোনাহ্, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই; বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ من حسن اسلام المرء تركه ما لايعنيه অর্থাৎ, 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মণ্ডিত হতে পারে।' এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ যাকাত ঃ এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলা হয়। কোরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণতঃ এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফরয হয়নি-মদীনায় হিজরতের পর ফরয হয়েছে। ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মেল মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরায়ও فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এর সাথে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সরকারী পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যাঁরা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য তাই। যারা বলেন যে, মদীনায় পৌঁছার পরই যাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এস্থলে যাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণতঃ কোরআন পাকে যেখানে ফরয যাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ও وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ - ايتاء ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এ ছাড়া فٰعِلُوْنَ শব্দটি স্বতস্ফূর্তভাবে فعل (কাজ)-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক যাকাত فعل নয়; বরং অর্থ-কড়ির একটা অংশ। فٰعِلُوْنَ শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে পারিভাষিক অর্থ নেয়া হলে যাকাত যে মুমিনের জন্যে অপরিহার্য ফরয তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেয়া হলে তাও ফরযই। কেননা, শেরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ্।

নফস্‌কে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরয।

চতুর্থ গুণ যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ, যারা স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ অর্থাৎ, যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে—জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ অর্থাৎ, বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়; যেমন—যিনা তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও যিনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে استمناء بالید অর্থাৎ, হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।— (বয়ানুল-কোরআন, কুরতুবী, বাহ্‌রে-মুহীত)

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়—হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত আমানত হোক কিংবা হুকুকুল-এবাদ তথা বন্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ্ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা। বন্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত; অর্থাৎ, কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাযত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্যে পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরী ও চাকুরীর জন্যে নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাযত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঃ অঙ্গীকার বলতে প্রথমতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরয এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়; অর্থাৎ, একতরফাভাবে একজন অন্য জনকে কিছু দেয়ার অথবা অন্যজনের কোন কাজ করে দেয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে العدة دين অর্থাৎ, ওয়াদা, এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ্। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে, কিন্তু এক তরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্যে আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ্।

সপ্তম গুণ নামাযে যত্নবান হওয়া ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা।— (রূহুল-মা'আনী) এখানে صلوات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দী সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صلوة শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ, নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক—নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লেখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হক ও বন্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামেল মুমিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যেরহকদার।

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযকে নামাযের মত পাবন্দী ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। قَدْ اَفْلَحَ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ – سلالة অর্থ সারাংশ এবং طِيْن অর্থ আর্দ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আঃ) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً

বলে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ, শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠসংখ্যক তফসীরবিদগণ আয়াতের এ তফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা, শুক্র খাদ্য থেকে উৎপন্ন এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ অর্থাৎ, মৃত্তিকার সারাংশ দ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পিঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ, রূহ সঞ্চার করণ।

হযরত ইবনে-আব্বাস বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব ঃ তফসীরে-কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে-কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার সমবেত সাহাবিগণকে প্রশ্ন করলেন ঃ রমযানের কোন্ তারিখে শবে কদর? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ্ তাআলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে-আব্বাস তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমীরুল-মুমিনীন! আল্লাহ্ তাআলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে-কদরও রমযানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবিগণকে বললেন ঃ এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গজায়নি ; অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। ইবনে-আব্বাস মানব-সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার আয়াতে উল্লেখিত আছে ঃ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۙ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۙ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا এই আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ اب জন্তুদের খাদ্য।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ, রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা ঃ কোরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে ঃ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ অর্থাৎ, আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদানও বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও সপ্তম স্তর অন্য জগত, রূহ জগত তথা রূহ্ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ ঃ এখানে خَلْقًا اٰخَرَ এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহ্হাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তফসীরবিদ 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে আছে, সম্ভবতঃ এই রূহ্ বলে জৈব রূহ্ বোঝানো হয়েছে, কারণ, এটাও বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহবিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ثم শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে-আরওয়াহ্' তথা রূহ্ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ্ তাআলা এসব রূহকে সমবেত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে بلٰى বলে আল্লাহ্র পালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হাঁ, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহ্ও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ – تخليق ও خلق এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ্ তাআলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خالق (স্রষ্টা) একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই। অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে خلق ও تخليق শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশী কিছু নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরী করা। একাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে ঃ وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছে ঃ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ এসব ক্ষেত্রে خلق শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে এখানে خالقين শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষ কারিগরীর দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ পূর্ববর্তী ১২-১৪ তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন ১৫ ও ১৬ আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সবাই এ জগতের আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ – অর্থাৎ, মৃত্যুর পর আবার কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছে দেয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাজির অল্প-বিস্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ – طريقة শব্দটি طَرَآئِقَ এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত

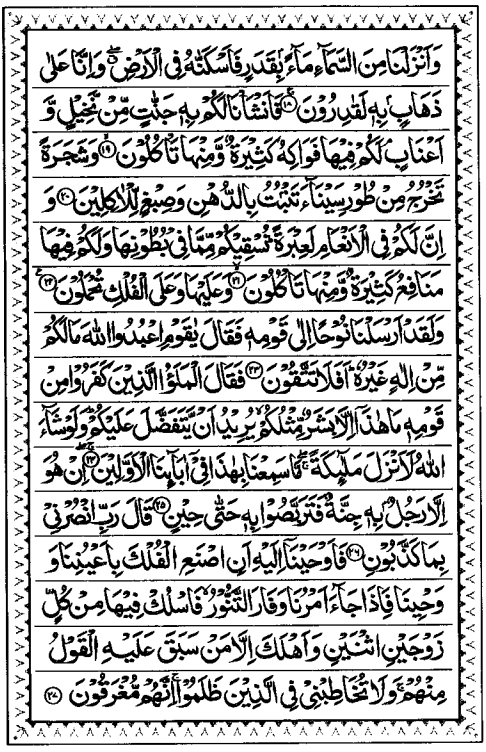

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ
ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَّ
أَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً
تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَ
إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا
مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم
مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن
قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ۖ مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ
إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي
بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ
وَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

(১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমান মত অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষন করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যে এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (২০) এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২১) এবং তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর। (২২) তাদের পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক। (২৩) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না! (২৪) তখন তার সম্প্রদায়ের কাফের-প্রধানরা বলেছিল ঃ এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। (২৫) সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (২৬) নূহ বলেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর, কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (২৭) অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও, প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া। এবং তুমি জালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে।

আকাশ তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। طريقة এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ, সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং তাদের পালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্যে খাদ্য ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্যে অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশী হয়ে গেলে তার জন্যে বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আযাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্যে বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা কোন কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন।

অতঃপর আরবের মেজায ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, এসব বাগানে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তুনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ যয়তুন বৃক্ষের জন্যে বিশেষতঃ তূর পর্বতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তুফানে-নূহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন।—(মাযহারী)

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِي نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا
وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾
ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ
الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَأَتْرَفْنٰهُمْ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا
لَّخٰسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ
مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ
إِلَّا رَجُلٌ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ
رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِينَ ﴿٤٠﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اٰخَرِينَ ﴿٤٢﴾

(২৮) যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল ঃ আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। (২৯) আরও বল ঃ পালনকর্তা, আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (৩০) এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী। (৩১) অতঃপর অন্য এক সম্প্রদায় আমি তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম। (৩২) এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৩৩) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাফের ছিল, পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল ঃ এতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও, সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (৩৪) যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সে কি তোমাদেরকে এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? (৩৬) তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে? (৩৭) আমাদের পার্থিবজীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করি না। (৩৯) তিনি বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (৪০) আল্লাহ্‌ বললেন ঃ কিছু দিনের মধ্যে তারা সকাল বেলা অনুতপ্ত হবে। (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই এক ভয়ংকর শব্দ তাদেরকে হতচকিত করল এবং আমি তাদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। অতঃপর ধ্বংস হোক পাপী সম্প্রদায়। (৪২) এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।

এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা এমন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছে, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তওহীদ ও এবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে; نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا অর্থাৎ, এসব জন্তুর পেটে আমি তোমাদের জন্যে পাক-সাফ দুধ তৈরী করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে ঃ শুধু দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক (অগণিত) উপকারিতা রয়েছে। وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুদের দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং তার দ্বারা মানুষের জীবনধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরী হয়। জন্তুদের পশম, অস্থি, অন্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুদের মাংসও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারদের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে অরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্তুদের সাথে নদীতে চালাচলকারী নৌকাও শরীক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ চাকার মাধ্যমে চলে এমন সেব যানবাহনও নৌকার হুকুম রাখে।

وَفَارَ التَّنُّورُ – تنور চুল্লীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্যে তৈরী করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কূফার মসজিদের এবং কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই নূহ্‌ (আঃ)-এর জন্যে মহাপ্লাবনের আলামত ঠিক করা হয়েছিল।—(মাযহারী) হযরত নূহ (আঃ), তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হেদায়েতের আলোচনা প্রসঙ্গে নূহ্‌ (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরকারকগণ বলেন ঃ লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে আ'দ অথবা সামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হুদ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামূদ সম্প্রদায়ের পয়গম্বর ছিলেন হযরত সালেহ্‌ (আঃ)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক صَيْحَةٌ অর্থাৎ, ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহা চীৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোন কোন তফসীরকারক বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে قَرْنًا اٰخَرِينَ বলে

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا
رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ
بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ
أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا
فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ
حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ
لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ
رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

(৪৩) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট কালের অগ্রে যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না। (৪৪) এরপর আমি একাদিক্রমে আমার রসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তাঁর রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। (৪৫) অতঃপর আমি মূসা ও হারূনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট সনদসহ, (৪৬) ফেরআউন ও তার অমাত্যদের কাছে অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল ঃ আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? (৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সৎপথ পায়। (৫০) এবং আমি মরিয়ম তনয় ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। (৫১) হে রসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্যে তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না। (৫৭) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে,

সামূদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, صَيْحَةً শব্দের অর্থ আযাব হলে আ'দ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই। কেয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো খোলাখুলি কাফেরই, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুঠে ওঠে। তারা পরকাল ও কেয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

طَيِّبَاتِ - يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই طَيِّبَاتِ দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র ও হালাল বস্তুসমূহই বোঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণকে তাঁদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর, দুই সৎকর্ম কর। আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্যে এই আদেশ আরও পালনীয়। বস্তুতঃ আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন ঃ এই দু'টি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহ্র সামনে দোয়ার জন্যে হাত প্রসারিত করে ইয়া রব, ইয়া রব-বলে ডাকে, কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরী হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে?—(কুরতুবী)

এ থেকে বোঝা গেল যে, এবাদতে ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে এবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً - أُمَّةٍ শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরীকা ও দ্বীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ আয়াতে দ্বীন ও তরীকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا - زُبُر শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে

وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّ
قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي
غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾
حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْأَرُوا
الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾
أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾
أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ
بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ
عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾

(৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, (৬১) তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ রয়েছে, যা তারা করছে (৬৪) এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চীৎকার জুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য চীৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হত, তখন তোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে। (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করে যেতে। (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? (৬৯) না তারা তাদের রসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন; (৭৪) আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

একই দ্বীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরীকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زبر শব্দটি কোন সময় زبرة এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দ্বীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেয়া মূর্খতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ — يُؤْتُونَ শব্দটি وَإِيتَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দেয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে অর্থাৎ, যা আমল করার তা আমল করে। এতে দান-খয়রাত, নামায, রোযা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কেরআত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে, কিন্তু উদ্দেশ্য হবে সাধারণ সৎকর্ম। যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীত-কম্পিত হবে? তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে সিদ্দীক তনয়া, এরূপ নয়; বরং এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবতঃ আমাদের এই কাজ আল্লাহ্র কাছে (আমাদের কোন ত্রুটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- মাযহারী) হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি এমন লোক দেখেছি, যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না।— (কুরতুবী)

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ দ্রুত সৎকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে। غَمْرَةٍ এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই غَمْرَةٍ শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরেকসুলভ মূর্খতাকে غَمْرَةٍ বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোনদিক থেকেই আলোর কিরণ পৌঁছাত না।

وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ অর্থাৎ, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে তো এক শেরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত।

مُتْرَفِيهِمْ শব্দটি ترف থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ঐশ্বর্য ও

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এ আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সে আযাব বোঝানো হয়েছে যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারও কারও মতে এই আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রসূলে করীম (সাঃ) কাফেরদের জন্যে খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন—

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى يوسف

(বোখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে بِهِ শব্দের সর্বনাম হরমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হরমের সাথে কোরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কোরাইশদের আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হরমের সাথে সম্পর্ক ও তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। سَامِرًا শব্দটি سمر থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাতি। চাঁদনী রাতে বসে গল্প-গুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই سمر শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। سامر বলা হয় গল্প গুজবকারীকে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হরমের সাথে সম্পর্ক, তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্প-গুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই।

تَهْجُرُونَ শব্দটি هجر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালি-গালাজ। আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ, তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তারা বলত।

এশার পর গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করা ঃ রাত্রিকালে কিস্‌সা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গোনাহ্‌সমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমতঃ এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও বহু রকমের গোনাহ্ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে,বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) এশার পর কাউকে গল্প-গুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন ঃ শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবতঃ শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তওফীক হয়ে যাবে।— (কুরতুবী)

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ থেকে أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত,তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্যে ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সবই বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ অর্থাৎ, রেসালত অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই; এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে— শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুওয়ত স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটিও একটি।

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ অর্থাৎ, তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুওয়তের দাবী নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাঁকে নবী ও রসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্ভ্রান্ততম কোরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র যমানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন'— সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ
وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾ حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَاتَ عَذَابٍ شَدِيْدٍ
اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي
الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ
وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوْا
مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾ قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ
عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا
مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ
وَمَنْ فِيْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْۢ
بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

(৭৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে। (৭৮) তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৮০) তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা-রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। (৮২) তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (৮৩) অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেয়া হয়েছে। এটা তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কথা বৈ কিছুই নয়। (৮৪) বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। (৮৫) এখন তারা বলবে ঃ সবই আল্লাহ্‌র। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (৮৬) বলুন ঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? (৮৭) এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ্। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৮৮) বলুন ঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? (৮৯) এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌র। বলুন ঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্‌র কাছে অথবা রসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এ আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহ্‌র কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরককেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দোয়ায় তা দূর হওয়া ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি? আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবু সুফিয়ান বলল ঃ আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ আয়াত নাযিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল।— (মাযহারী)

وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা, আযাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই যে, তার মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাআলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।— (কুরতুবী)

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ
وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾ عٰلِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾ قُلْ رَّبِّ اِمَّا
تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾
اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾
وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ
رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾ فَاِذَا نُفِخَ
فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ
خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

(৯০) কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে। (৯৩) বলুন ঃ 'হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, (৯৪) হে আমার পালনকর্তা! তবে আপনি আমাকে গোনাহ্গার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।' (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (৯৭) বলুন ঃ 'হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (৯৮) এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (৯৯) যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে ঃ 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন, (১০০) যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।' কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (১০১) অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, (১০৩) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। (১০৪) আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর আযাবের ভয় প্রদর্শন উল্লেখিত হয়েছে। কেয়ামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়, তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর যমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সৎলোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোন আযাব ভোগ করবে না, বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। কোরআন পাক বলে ঃ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً অর্থাৎ, এমন আযাবকে ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু জালেমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ্, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই জালেমদের সাথে রাখবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহ্র আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন।— (কুরতুবী)

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ অর্থাৎ, আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আযাব দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ, আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আযাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ — অর্থাৎ, আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জওয়াবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জেহাদের অবস্থাও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন— কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার

নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এই ঃ

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ

همز — শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেয়া। পশ্চাদ্দিক থেকে আওয়াজ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালেদ (রাঃ)-এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-তাঁকে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এই ঃ

اعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شــر عباده ومن همزات الشيٰطين وان يحضرون ـ

أَنْ يَّحْضُرُوْنِ —সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে।—(কুরতুবী)

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رَبِّ ارْجِعُوْنِ —অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম।

ইবনে জরীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে ; তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব? আমাকে এখন আল্লাহ্র কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, رَبِّ ارْجِعُوْنِ অর্থাৎ, আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

بَرْزَخٌ —এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয় তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কেয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযখে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কেয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবনও পায় না, এটাই আইন।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ —কেয়ামতের দিন দু'বার শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের ফলে যমীন-আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কোরআন পাকের ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আয়াতে একথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শিংগায় প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুঁৎকার— এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়রের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। তফসীরে-মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের ভাষ্য এই যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমন্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিম্মায় কারও প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সচেষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ —বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারও প্রতি রহম করবে না।

প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু তাই

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ

অর্থাৎ, সেদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থার পার্থক্য ঃ কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে —মুমিনগণের নয়। কারণ, উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন বলে যে, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ -অর্থাৎ, সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ্ তাআলা (ঈমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে।

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوْا
رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ
اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا
وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾
فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ
تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾ اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ
الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾
قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾
قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾
اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾
فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ
لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾
وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

(১০৫) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। (১০৬) তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। (১০৭) হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব। (১০৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। (১০৯) আমার বন্দাদের একদলে বলতঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। (১১১) আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (১১২) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়? (১১৩) তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। (১১৪) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে? (১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? (১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (১১৭) যে কেউ আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। (১১৮) বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যেই।—(মাযহারী)

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও উপকার করতে পারবে না) —আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ, তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না, কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

وَلَا يَتَسَآءَلُوْنَ —অর্থাৎ, পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। এরপর কোন অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে।—(মাযহারী)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ
فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে-ই হবে সফলকাম। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতে শুধু কামেল মুমিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামেল মুমিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে, তদেরকে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকতে হবে।

وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ - كالح অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নীচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تُكَلِّمُوْنِ —হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ এটা হবে জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না ; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন ঃ কোরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জওয়াবে وَلَا تُكَلِّمُوْنِ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর

سورة النور مدنية وهي اربع وستون آية وتسع ركوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ۝١ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢ اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ
الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا
بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ
شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٤ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥ وَالَّذِيْنَ
يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٦
وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧

সূরা আন্-নূর

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৬৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) এটা একটা সূরা যা আমি নাযিল করেছি, এবং দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২) ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর-করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। (৪) যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবূল করবে না। এরাই না'ফরমান। (৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (৬) এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত।

তারা কিছুই বলতে পারবে না।—(মাযহারী)

সূরা মু'মিনূনের সর্বশেষ আয়াতসমূহ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا থেকে নিয়ে শেষ সূরা পর্যন্ত বিশেষ ফযীলত পূর্ণ। বগভী ও সা'লাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্যলাভ করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সে আল্লাহ্‌র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে।

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ —এখানে اِغْفِرْ ও اِرْحَمْ উভয়ের **مفعول** তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ, কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ; অর্থাৎ, মাগফেরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা, ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানবজীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।—(মাযহারী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফেরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত।—(কুরতুবী)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ —সূরা মুমিনূনের সূচনা اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং সমাপ্তি لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ দ্বারা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, ফালাহ্ অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সফলতা মুমিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত।

সূরা আন্-নূর

সূরা নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ এই সূরার অধিকাংশ বিধান নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ ও পর্দা-পুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপূরক হিসেবে ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল-মু'মেনূনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম। এ সূরায় সতীত্বের প্রতি গুরুত্বদানের জন্যে এতদসম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) কূফাবাসীদের নামে এক ফরমানে লিখেছিলেন ঃ علموا نساء كم سورة النور অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সূরা আন্-নূর শিক্ষা দাও।

এ সূরার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে ; অর্থাৎ, سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا এটাও এ সূরার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।